বিজ্ঞানের গান

রায়হান আবীর

মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর বিকাশ নিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর প্রয়াসে ২০০৫ সালে বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় বিজ্ঞানলেখক ও মুক্তমনা ওয়েবসাইটের সম্পাদক অভিজিৎ রায় লিখেছিলেন, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' শিরোনামের বই[১]। বইটির 'লেখকের কথা' অংশে বিজ্ঞান সম্পর্কে দু চার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন,

> 'বিজ্ঞানের অবদান কি কেবল বড় বড় যন্ত্রপাতি বানিয়ে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনা? আমাদের স্কুল কলেজে যেভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হয় তাতে এমনটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্যপারটা কিন্তু আসলে ঠিক তেমন নয়। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ বড় বড় যন্ত্রপাতি বানায় বটে; তবে সেগুলো স্রেফ প্রযুক্তিবিদ্যা আর প্রকৌশলবিদ্যার আওতাধীন; বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের অভিযোজন মাত্র। আসলে বিজ্ঞানের একটি মহান কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে বোঝা, প্রকৃতিতে ঘটনলীর ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এখানেই। হ্যাঁ, জ্যোৎস্না রাত কিংবা পাখীর কুজনের মত বিজ্ঞানেরও একটি নান্দনিক সৌন্দর্য্য আছে, সৌকর্য্য আছে- যার রসাস্বাদন কেবল বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানসনস্ক বা বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত মর্মকথা বুঝতে হলে বিজ্ঞানীই হতে হবে এমন কোন কথা নেই, তবে বিজ্ঞান-প্রেমিক হতে হবে বলাই বাহুল্য। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কার্ল স্যাগান তাঁর বিখ্যাত 'The Demon-Haunted World' বইয়ের ভূমিকায় এ কারণেই হয়তো বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করাকে এক ধরণের বিকৃত মনোভাব বলেই আমার মনে হয়। যখন মানুষ প্রেমে পড়ে, তখন সারা পৃথিবীর কাছে সে তার প্রেমের কথা প্রচার করতে চায়। এ বইটি আমার প্রেমের একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি, বিজ্ঞানের সাথে আমার সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথা'।

'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটি বেরুনোর পরে অনেকেই একে বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের একটি মাইলফলক হিসেবে দেখেছিলেন। এক বছরেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিলো। ড. শাব্বির আহমেদ, ড. বিপব পাল, ড. হিরন্ময় সেনগুপ্ত, ড. শহিদুল ইসলাম, ড.বিনয় মজুমদারের মত বরেন্য লেখক এবং শিক্ষাবিদেরা বইটির রিভিউ করেছিলেন । সে সব রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে এনএফবি, অবজারভার, হলিডে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, মৃদুভাষণ, ভোরের কাগজ সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। প্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল কালি ও কলমের একটি সংখ্যায় গ্যালিলিওকে নিয়ে লিখতে গিয়ে বই থেকে রেফারেন্স দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বেশ বড়সড় করে আয়োজিত প্রকাশনা উৎসবে বইটির ঢালাও প্রশংসা করেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাহিত্যিক বশীর আল হেলাল, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্ত, লেখক ও সংকলক মীজানুর রহমান (মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা খ্যাত) সহ অনেকেই।

কিন্তু যে ব্যাপারটি বলার জন্য এখানে এতো আয়োজন তা হল, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারনাগুলোর পাশাপাশি, শেষ অধ্যায়টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে 'ঈশ্বর অনুকল্প'টি নিয়েও নিরপেক্ষ আলোচনা ছিলো । আর এখানেই দেখা দিয়েছিলো একটি মজার সমস্যা। 'আলো হাতে চলিয়ায়ছে আঁধারের যাত্রী' বইটির ভুমিকা লিখেছিলেন বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশীদ। তিনি বইটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য প্রক্ষেপণের পরেও ভুমিকার শেষ দিকে একটি বাক্য জুড়ে দেন

-

> ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয় এটা বুঝতে তরুণ মনের সময় লাগে অনেক, তবে সে পথে আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীকে নিরুৎসাহিত করা মোটেও উচিৎ নয় বলেই আমার মনে হয়' ।

উপরে এ এম হারুন অর রশীদ ' ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়' বলে যে উক্তিটি বইয়ের ভূমিকায় করেছিলেন তা খুব পরিচিত এবং জনপ্রিয় ধারণার প্রতিফলন । এ এম হারুন অর রশীদ থেকে শুরু করে অধ্যাপক জাফর ইকবালের মত জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকেরা প্রায়ই আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে পার্থিব জ্ঞানের চর্চা করা, ঈশ্বর কিংবা এ ধরণের অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কখনোই কোন অভিমত দিতে পারে না বিজ্ঞান । তাই ও নিয়ে টু-শব্দ করা বিজ্ঞান লেখকদের অনুচিত । কিন্তু সত্যই কি তাই?

বিজ্ঞান সত্যই কি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে অভিমত দিতে অক্ষম?

আগের দিনে মানুষেরা বাড়ি থেকে একটু দূরে থাকা পুকুরের অপর পাড়ে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে ভাবতো সেটা বুঝি কোনো ভুত-জ্বিন-পরীর কাজ । এরপর মঞ্চে হাজির হলো বিজ্ঞান । বিজ্ঞান এসে আমাদের জানালো মিথেন গ্যাসের কথা । আমাদের মনে থাকা জ্বিন পরীর গল্পকে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে সেখানে বসিয়ে দিলো আসল সত্য । এখন আর কেউ পুকুর পাড়ে আগুন জ্বলতে দেখলে ভয় পায়না, তারা জানে এটা সম্পূর্ন প্রাকৃতিক ব্যাপার ।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় - এভাবেই মানুষের মনে জমে থাকে থাকা অসংখ্য কুসংস্কারের কালো নিকষ আঁধার দূর করে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে বিজ্ঞান । বিজ্ঞানের এই গুনের কারণে এই ধারণাটিকে আমরা আশীর্বাদ মনে করি । কিন্তু যেই বিজ্ঞান আমাদের মনের সবচেয়ে বড় কুসংস্কার সম্পর্কে কিছু বলতে যায়, ওমনি শুরু হয়ে যায় তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য । আমাদের মনের কুসংস্কারটিকে সমূলে উৎপাটিত করে দিবে বিজ্ঞান, আমাদের মৃত্যু পরবর্তী সুখের জীবনকে তছনছ করে বিজ্ঞান, অবচেতন মনের এই ভাবনায় আমরা কখনই বিজ্ঞানের সেই কুসংস্কার নিয়ে কথা বলা মেনে নিতে পারিনা ।

ইন্টারনেটে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে গিয়ে প্রায়শই এমন মানুষের মুখোমুখি হই । তাদের মাঝে অনেকেই বলেন, বিজ্ঞান হলো যুক্তি এবং কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োগ আর ধর্ম হলো বিশ্বাস । এ দুয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা বলয়ে । বিজ্ঞান দিয়ে কোনভাবেই ঈশ্বর নামক বিষয়ে কথা বলা যাবেনা । তারা বিজ্ঞান ভালোবাসেন কিন্তু একই সাথে মনে করেন যে, ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমানে বিজ্ঞানকে টেনে আনাটা খুবই হাস্যকর । যদিও তারা ভুতে "বিশ্বাসের" মতো বিষয়ে বিজ্ঞানকে টেনে নিয়ে এসে এই বিশ্বাসকে কচুকাটা করাটাকে হাস্যকর মনে করেন না, কোনভাবেই । হাস্যকর মনে করেন না অসুখ বিসুখ হলে সাপের মন্ত্র না জপে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াকে , তারা শুধু হা রে রে রে রে করে ওঠেন যখন ধর্ম, ঈশ্বর আর অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কথা চেষ্টা করা হয় ।

কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার হল, পশ্চিমা বিশ্বের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা আজ ' ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়' ধরণের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সঠিক অবস্থান নিতে শুরু করেছেন । যেমন, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার অতি সাম্প্রতিক বই 'গ্রান্ড ডিজাইন' -এ সরাসরি বলেছেন[২]- মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি'র পেছনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই । মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে স্বতস্ফুর্তভাবে তৈরি হয়েছে । মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের আমদানি একেবারেই অযথা । তার নতুন বই 'গ্রাণ্ড ডিজাইন'-এ খুব চাঁচাছোলা ভাবেই বলেন

(গ্র্যান্ড ডিজাইন, পৃষ্ঠা ১৮০)-

> 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রের মতো পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র কার্যকর রয়েছে, তাই একদম শূন্যতা থেকেও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব এবং সেটি অবশ্যম্ভাবী। 'স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি' হওয়ার কারণেই 'দেয়ার ইজ সামথিং, র‍্যাদার দ্যান নাথিং', সে কারণেই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের। মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় বাতি জ্বালানোর জন্য ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই ।'

আসলে ঈশ্বর সহ বেশ কিছু তথাকথিত অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান যে সুস্পষ্ট অভিমত দিতে পারে তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছিলো। বিশেষতঃ ২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে পাঁচজন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের দ্বারা ছয়টি 'বেস্ট সেলিং' পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেই স্বনামখ্যাত লেখকেরা হচ্ছেন - স্যাম হ্যারিস, ডেনিয়েল ডেনেট, রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেঙ্গর এবং ক্রিস্টোফার হিচেন্স। তারা খুব সুস্পষ্টভাবে অভিমত দিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে,সে অবস্থান থেকে সে ঈশ্বর সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুকল্পগুলো পরীক্ষা করে উপসংহারে পৌঁছুতে সক্ষম। তাদের এই নতুন আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী 'নব্য নাস্তিকতা'র আন্দোলন (New Atheism Movement) হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে[৩]।

বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের নানা দিকে বিবর্তন ঘটেছে। ঈশ্বর সংজ্ঞায়িত নন, ঈশ্বর বিজ্ঞানের বিষয় নন, কিংবা ঈশ্বরকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করা যায় না - এমন বক্তব্যগুলোকে এখন আর ঢালাওভাবে পতাকার মত বহন করা হয় না। যেমন জুডিও-খ্রিস্টান-ইসলামিক ঈশ্বরের অনেক বৈশিষ্ট্য যে সুসংজ্ঞায়িত তা ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। যেমন, সেই ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ঈশ্বর - তিনি রাগ ক্ষোভ ঘৃণা প্রকাশ করেন, অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেন, তার জন্য আরশ বা সিংহাসন রয়েছে, ইত্যাদি। এখন এধরণের ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব তৈরি করে থাকেন, জীবন তৈরির পরিকল্পনা এবং নকশা প্রণয়ন করে থাকেন, প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে থাকেন তবে কিন্তু সেসব দাবীগুলো আমাদের পরীক্ষা করে যাচাই করতে পারার কথা। আমরা আজ জানি, যাচাইয়ের পর বেশ অনেক দাবীই ইতিমধ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরাই তা করেছেন। বিবর্তন তত্ত্বই প্রমাণ করেছে জেমস আশারের ৪০০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী কিংবা ২৩৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নূহের পাবনের কেচ্ছা মিথ্যা। এধরণের অনেক কিছুই ভবিষ্যতেও যে বিজ্ঞান ভুল প্রমাণ করবে না তা কে বলতে পারে? যেমন, নব্যনাস্তিকতাবাদী বিজ্ঞানীরা মনেই করেন, যীশুর ভার্জিন বার্থ, পুনরুত্থান, আত্মার অস্তিত্ব কিংবা মৃত্যুর পরে তার বেঁচে থাকা -ধার্মিকদের কাছ থেকে আসা এই দাবীগুলো আসলে প্রকারন্তরে বৈজ্ঞানিক দাবীই, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা যাবে। রিচার্ড ডকিন্স তার শীর্ষ বিক্রিত বই গড ডিলুশনে পরিস্কার করেই বলেন,'বিনা পিতায় যীশু জন্মাতে পারেন কিনা তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অংশ, কোন নৈতিকতা বা মূল্যবোধের প্রশ্ন নয়[৪]।

বিজ্ঞানীরা এখন বলেন, ঈশ্বরের প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া কিংবা সত্যিকার ঈশ্বর কে - এই হাইপোথিসিসগুলো কিন্তু সহজেই পরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়। যেমন, ধরা যাক একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হল যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান রোগীর জন্য আলাদা করে প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হবে। দেখা গেল ইসলামী প্রার্থনাতেই রোগী কেবল ভাল হচ্ছে - কিংবা মুসলিম রোগী পটাপট সেরে উঠছে, আর বাকিরা পটল তুলছে, তাহলে সাথে সাথে আমরা বুঝে নিতাম ইসলামী আলাহই সত্যিকার ঈশ্বর, কারণ তিনিই প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু এ ধরণের ঘটনা ঘটেনি। বরং মায়ো ক্লিনিক, ডিউক ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো প্রার্থনার সাথে রোগির ভাল হওয়ার কোন সম্পর্কই খুঁজে পায়নি[৫]।

আব্রাহামিক ধর্মগুতে বর্ণিত ঈশ্বর পরস্পররবিরোধী একটি সত্ত্বা। যেমন বাইবেলের ধারনা অনুযায়ী ঈশ্বর অদৃশ্য (Col. 1:15, ITi 1:17, 6:16), এমন একটি সত্ত্বা যকে কখনও দেখা যয় নি (John 1:18, IJo 4:12)। অথচ বাইবেলেরই বেশ কিছু চরিত্র যেমন মুসা (Ex 33:11, 23), আব্রাহাম, জেকব (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর পরিস্কার করেই বাইবেলে বলেছেন - 'তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না, আমাকে দেখার পর কেউ বাঁচতে পারবে না' (Ex 33: 20)। অথচ, জেকব ঈশ্বরকে জীবন্ত দেখেছেন (Ge 32:30)। এগুলো তো পরিস্কার স্ব-বিরোধীতা। ঠিক একই কথা বলা যায় হজরত মুহম্মদের 'মিরাজে'র ক্ষেত্রেও। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, 'সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত'। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আলাহতা'লা কি ঐ সময় হযরত (দ.) - এর অন্তরে বা তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না? পবিত্র কোরানে আলাহ বলিয়াছেন - 'তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন' (সুরা হাদিদ - ৪)। মেরাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি?'

আসলে আব্রাহামিক গড হিসবে চিত্রিত অনেক এট্রিবিউটকেই যুক্তির নিরিখে পরীক্ষা করে ভুল প্রমাণ করা যায় তা পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেংগর দেখিয়েছেন তার 'গড - দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস' বইয়ে। তিনি বলেন,

> আমি আমার বইয়ে ধার্মিকদের দেওয়া ঈশ্বরের অনুকল্প নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবেই আলোচনা করেছি, এবং আমার উপসংহার হচ্ছে আব্রাহামিক ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

আবার, ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করতে যে ধরণের গুনাবলী আরোপ করা হয় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সেগুলো পরস্পর বিরোধী কিনা। যেমন, কেউ যদি চারকোনা বৃত্তের অস্তিত্ব দাবী করে, সেটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে এই ধারনাটি পরস্পর বিরোধী। ধর্ম-দর্শন নির্বিশেষে যে বেশিষ্ট্যগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে সচরাচর মহিমান্বিত করা হয় সেগুলো সবই দেখা গেছে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে খুবই ভঙ্গুর। যেমন, ঈশ্বরকে বলা হয় 'পরম দয়াময়' (all-loving) এবং সর্ব শক্তিমান (all-powerful or omnipotent), নিখুঁত (perfect), সর্বজ্ঞ (omniscient) ইত্যাদি। কিন্তু সর্বশক্তিমত্তা (omnipotence) এবং সর্বজ্ঞতা (omniscience) যে একসাথে প্রযোজ্য হতে পারে না তা যুক্তিবাদীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যেমন, ক্যারেন ওয়েন্স তা সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত পংক্তিতে তুলে ধরেন[৬]-

> Can Omniscient God, who
> Knows the future, find
> The omnipotence to
> Change His future mind?

কথা হচ্ছে, ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ বা 'অমনিসায়েন্ট' হন, তবে তিনি আগে থেকেই জানেন যে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনায় হস্ত ক্ষেপ করে সেটি পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা তিনি শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করতেই পারেন- কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, আফটার অল! কিন্তু মুশকিল হল, তিনি কি করবেন তা অনেক আগে থেকেই জানার মানে হল শেষ সময়ে আকস্মিকভাবে মত পরিবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর তার পক্ষে কোন কিছু অসম্ভব মানেই হচ্ছে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান নন, তা নিচের প্রশ্নটির সাহায্যে সহজেই দেখানো যেতে পারে;

যদি প্রশ্ন করা হয় -

> 'ঈশ্বর কি এমন কোন ভারী পাথরখন্ড তৈরি করতে পারবেন, যা তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারবেন না?'

এ প্রশ্নটির উত্তর যদি হ্যা হয়- তার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নিজের তৈরি পাথর নিজেই তুলতে পারবেন না, এর মানে তিনি সর্বশক্তিমান নন। আবার প্রশ্নটির উত্তর যদি না হয়, তার মানে হল, সেরকম কোন পাথর তিনি বানাতে পারবেন না, এটাও প্রকারান্তরে তার অক্ষমতাই প্রকাশ করছে। এ থেকে বোঝা যায়, অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। দেখা গেছে, মানুষের কাছে যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তা ঈশ্বরও তৈরি করতে পারছেন না। ঈশ্বর পারবেন না চারকোনা বৃত্ত আঁকতে, ঈশ্বর পারবেন না কোন 'বিবাহিত ব্যাচেলর' দেখাতে কারণ এগুলো যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

ঈশ্বর যে পরম করুণাময় বা 'অল লাভিং' নন, তা বুঝতে রকেট সায়ন্টিস্ট হতে হয় না। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধানে' গ্রন্থে বলেছেন,

> 'কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুণ্ঠণ করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ, তবে তাহাকে 'দয়াময়' বলা যায় কি? হয়ত তাহার উত্তর হইবে - 'না'। কিন্তু উপরোক্ত কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন 'দয়াময়' নামে। ... জীব জগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে দয়াময় বটে, কিন্তু তখন কি তিনি খাদ্য-প্রাণীটির কাছেও দয়াময়? যখন একটি স্বর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি স্বর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হন, তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? ... কাহারো জীবন রক্ষা করা যদি দয়ার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদকের ব্যাপারে ঈশ্বর সদয়ের চেয়ে নির্দয়ই বেশী। তবে কতগুন বেশী তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেউ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবন রক্ষর জন তিন কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন?... কেহ কেহ মনে করেন ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়, বন্যা, মহামারী, ভুমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?'

আরজ আলীর প্রশ্নমালা মানব মনের অন্তহীন সংশয়বাদী চিন্তাকেই তুলে ধরেছে সার্থকভাবে।গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ বিসি) সর্বপ্রথম 'আর্গুমেন্ট অব এভিল' (Argument of Evil)-এর সাহায্যে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' অসারতা তুলে ধরেন এভাবে :

> ঈশ্বর কি অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা নিরোধে ইচ্ছুক, কিন্তু অক্ষম?

তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

তিনি কি সক্ষম, কিন্তু অনিচ্ছুক?
তাহলে তিনি পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী সত্ত্বা।

তিনি কি সক্ষম এবং ইচ্ছুক -দুটোই?
তাহলে অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা পৃথিবীতে বিরাজ করে কিভাবে?

তিনি কি সক্ষমও নন, ইচ্ছুকও নন?
তাহলে কেন তাঁকে অযথা 'ঈশ্বর' নামে ডাকা?

অকাট্য এই যুক্তি। ' The Oxford Companion to Philosophy ' স্বীকার করেছে যে, সনাতন আস্তিকতার বিরুদ্ধে আর্গুমেন্ট অব এভিল বা 'মন্দের যুক্তি' সবচেয়ে শক্তিশালী মরণাস্ত্র, যা কেউই এখন পর্যন্ত ঠিকমত খন্ডন করতে পারেনি[৭]। এ তো নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, পেগ, মহামারী, খড়া, বন্যা, সুনামীর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ কোটি নিরপরাধ নর-নারী এবং শিশুর মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষকে কোনভাবেই দায়ী করা চলে না। এ সমস্ত অরাজগতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ঈশ্বর একটি অপকারী সত্ত্বা। কারণ 'সর্বজ্ঞ' ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন যে, সুনামীর ঢেউ আছড়ে পরে তার নিজের সন্তানদের হত্যা করবে, তাদের স্বজন হারা করবে, গৃহচ্যুত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর বাড়ি ধ্বংস করে এক অশুভ তান্ডব সৃষ্টি করবে। অথচ আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও সেসব প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থাই তিনি নিতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈশ্বর এক অক্ষম, নপুংশক সত্ত্বা বই কিছু নয়। দার্শনিক পল কার্জ তার 'ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে যে কারণে আমি সংশয়বাদী' প্রবন্ধের একটি অংশে 'আর্গুমেন্ট অব এভিল' নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন[৮]। এ ছাড়া, মুক্তমনায় বহু লেখক বিশেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আসলে পরস্পরবিরোধী[৯]।

ভিক্টর স্টেঙ্গর পেশায় হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান' বিভাগের ইমিরিটাস অধ্যাপক এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সংযুক্ত অধ্যাপক (Adjunct Professor)। তিনি একবিংশ হতাব্দীর এই নব্যনাস্তিকতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত। ভিক্টর স্টেঙ্গর তার 'গড - দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস'বইয়ে সর্বজ্ঞ (Omniscient), পরম করুণাময় (Omnibenevolent) এবং সর্বশক্তিমান (Omnipotent) ঈশ্বর (3O God) থাকাটা যে যৌক্তিকভাবে অসম্ভব তা দেখিয়েছেন[১০]। একই ধরণের উপসংহারে পৌঁছিয়েছেন মাইকেল মার্টিন এবং রিকি মনিয়ার তাদের The Impossibility of God বইয়ে[১১]। কাজেই ঈশ্বরের কোন বৈশিষ্ট যৌক্তিকভাবে পরীক্ষা করে বাতিল করে দেয়া যাবে না, কিংবা বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কোন অভিমত দিতে পারে না - তা কিন্তু এখন আর ঠিক নয়। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্সও মনে করেন ধার্মিকদের দেয়া ঈশ্বরের অনেক সংজ্ঞাই টেস্টেবল হাইপোথিসিস, এবং তিনি তার সাম্প্রতিক 'গড ডিলুশন' বইয়ে এর অনেকগুলোই খন্ডন করেছেন। এরকম অনেক অনুকল্পের বেশ কিছু পরীক্ষা এখনই করা যায়, বাকিগুলো হয়তো প্রযুক্তি উন্নত হলে করা যাবে। অন্তত আব্রাহামিক ধর্মগুলোর ঈশ্বরের যে সংজ্ঞায়ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, তা যে অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেজন্যই ভিক্টর স্টেঙ্গর তার নিউ এথিজম বইয়ে বলেন -

> The new atheists firmly assert that the personal, abrahamic God is a scientific hypothesis that can be tested by the standard method of science. And we have seen that it has failed

the test.

এবারে নব্য নাস্তিকতাবিরোধী কিছু উদাহরণের সাথে পাঠকদের পরিচিত করিয়ে দেয়া যাক। নব্য নাস্তিকদের বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত, জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বর আলোচনার একজন কড়া সমালোচক খ্রিষ্টান ধর্মবেত্তা ডেভিড মার্শাল। The Truth behind the New Atheism বইয়ে তিনি বলেন[১২],

> এই নব্য নাস্তিকরা বাস্তবতার বিভিন্ন দিক একেবারেই বুঝতে পারেনা। প্রথমত, বোকা নাস্তিকদের বিজ্ঞানের সীমারেখা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। দ্বিতীয়ত, তাদের তত্ত্বগুলো অসংখ্য বাস্তবতাকে সরাসরি উপেক্ষা করে। তৃতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে তারা সবসময় নিজেদের বিরত রাখে। চতুর্থত, তাদের তত্ত্বকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাতে তারা চমৎকার এক ছলনার আশ্রয় নেয়, সেই ছলনা হলো- "মনে করি"" ।

বিজ্ঞানের সীমারেখা বুঝতে অপারগ একজন বোকা কিংবা চালাক নাস্তিকের নাম উলেখ করেননি, মার্শাল। নব্য নাস্তি কদের বই, তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধ, ইয়ুটিউবে থাকা শতশত ভিডিও লেকচারে আমরা কখনওই তাদের বলতে শুনিনি, যে বিজ্ঞানের সীমারেখা অসীম। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এদের লেখা বইগুলোতেই বরঞ্চ সংগীত, ছবি, কবিতা, নারীপুরুষের ভালোবাসার সম্পর্ক সহ আরও অসংখ্য প্রকৃতিপ্রদত্ত অ-বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে চমৎকার মনমুগ্ধকর আলোচনা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার[১৩]। আমি গান ভালোবাসি, ভালোবাসি আলোচনা, কবিতা, ফুল, ভালোবাসি ভালোবাসতে, কিংবা ভালবাসা পেতে। কিন্তু একই সাথে অন্যান্য অনেকের মতো মনে করিনা যে, এই অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া চমৎকারভাবে উপভোগ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, মহাকবি কীট্স্ একবার নিউটনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন যে আলোকের সূত্রের দ্বারা রংধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি রংধনুর সৌন্দর্যকেই ক্ষুন্ন করে দিয়েছেন। অথচ কীট্স্ই আবার অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সত্যই সুন্দর! আরেকবার, পদার্থবিদ ফাইনম্যানকে তাঁর এক শিল্পী বন্ধু হাতে একটা ফুল হাতে নিয়ে বলেছিলেন, "একজন শিল্পী হিসেবে আমি এই ফুলের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম, আর তোমরা বিজ্ঞানীরা এটাকে ভেঙ্গে চুরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর সৌন্দর্যকেই নষ্ট করে দাও"। এর উত্তরে ফাইনম্যান বলেছিলেন যে একজন শিল্পী ফুলে যে সৌন্দর্য দেখতে পান, তিনিও সেই একই সৌন্দর্য দেখতে পান, কিন্তু উপরন্তু তিনি ফুলের ভেতরকার সৌন্দর্যকেও দেখতে পান, যেমন কি ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা ফুলের পাপড়ি গঠিত হয়, কিভাবে বৈবর্তনিক উপযোজনের কারণে কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করার জন্য ফুলের সুন্দর রঙের সৃষ্টি হয়েছে, এই সব, যা থেকে তাঁর শিল্পী বন্ধু বঞ্চিত[১৪]।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাই ধরি। গানের ফিজিক্স বোঝার মাধ্যমে একে আরও ভালোভাবে উপভোগ, উপস্থাপন করার সুক্ষ্মতা উদ্ভাবনের পাশাপাশি , আবিষ্কৃত হয়েছে নানা যন্ত্রপাতি। রেকর্ডিং করার উপায় আবিষ্কারের মাধ্যমে যেকোনো পরিস্থিতিতে গান যে কাউকে সংগ দিতে পারে। বিজ্ঞানের কারণে আমরা নিজেরাও এখন ছবি তুলে/ এঁকে সেগুলো ফ্লিকারে আপলোড করার মাধ্যমে সবার সাথে শেয়ার করতে পারি। দুনিয়ার প্রায় সকল কবিতা, গল্প খুব কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসবে ইন্টারনেটে। স্টিফেন হকিং এর নতুন বই পড়ার জন্য মানুষের এখন আর বছর খানেক অপেক্ষা করতে হয়না, তারা আমাজনে চট করে অর্ডার দিয়ে পরের দিন হাতের কাছে পেয়ে যায়।

কোন ধরণের উদাহরণ না দিয়ে মার্শাল তার তৃতীয় ও চতুর্থ দাবী, বাস্তবতাকে পাশ কাটানো, এবং "মনে করি" ব্যাপারটাকে কটাক্ষ করে কি বোঝাতে চেয়েছেন সেটা বোধগম্য হলোনা কোনোভাবেই।

বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পণা (Intelligent Design) নামক ছদ্মবিজ্ঞানের এক মুখোপাত্র ডেভিড বারলিনস্কি (David Berlinski)

বিজ্ঞানীদের চরিত্র নিয়ে গবেষনার পর প্রবন্ধে লিখেন, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা গোঁয়ার, অন্তসারশূন্য, রাজনীতিতে অপরিপক্ক, অলস এবং অহংকারী[১৫] । রেফারেন্স ছাড়াই বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লাইন তুলে ধরে তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা সবকিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত[১৬] । অবশ্যই বিজ্ঞানীরা যে কোন কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যদি সেটা বিশ্বাস করার মতো পর্যাপ্ত প্রমান থাকে । হ্যাঁ! মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণা পড়ে আমাদের সেটা অর্থহীন, অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু সেটার দোষ তো বিজ্ঞানীদের না । ব্যাপারগুলো আমাদের দৃষ্টিভংগিতে অর্থহীন বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয় । কারণ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পন্ন হয় বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে । প্রতিটি আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আরও অসংখ্য তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত হয় ।প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ধারণা যিনি আবিষ্কার করেছেন শুধু তার জন্য সত্য না, বরঞ্চ সেটা পৃথিবীর যে কোন ল্যাবরেটরিতে, যে কোন মানুষ দ্বারা স্বাধীনভাবে পরীক্ষা যোগ্য ।

গ্রুপ মেইলে হঠাৎ করেই একবার ধর্ম- নিধ্বম আলোচনায় একজন বিশাল এক মেইল করে বসলেন । আস্তিকতা- নাস্তি কতা বিষয়ে অনেক বই তিনি পড়েছেন, এই দাবীসম্বলিত বিশাল মেইলে নাস্তিকদের উদ্দেশ্য করে বলা কথাটির সারমর্মঃ "ঈশ্বরের মতো একজন যিনি স্থান,কালের উর্দ্ধে, তার অস্তিত্ব মাপার জন্য পার্থিব পরিমাপ, ওজন, গনিত ব্যবহারের মতো হাস্যকর কিছুই আর হতে পারেনা" । নাস্তিকতার বিপক্ষে প্রচলিত এই কথাটি অযৌক্তিক হলেও অসংখ্য বিজ্ঞানী দুঃখজনকভাবে এটি সমর্থন করে থাকেন । রক্ষণশীল লেখক এবং বক্তা দিনেশ ডি'সুজা জীববিজ্ঞানী ডগলাস এরউইনকে উদ্ধৃত করে বলেন, বিজ্ঞানের অন্যতম একটি নিয়ম বা ধারা হচ্ছে, সকল ধরণের মিরাকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা[১৭] । তার মানে কি এই দাঁড়ালো যে, সত্যিকার অর্থেই ব্যাখ্যাতীত মিরাকলের সন্ধান পাওয়া গেলে বিজ্ঞান সেটা অস্বীকার করবে? কোন সুস্থ মস্তিষ্কের যুক্তিমনস্ক মানুষই দিনেশ ডি'সুজার বক্তব্যকে সমর্থন করার কথা না ।

দিনেজ সু'জা জীববিজ্ঞানী ব্যারি পালেভিটয কে উদ্ধৃত করে আরও বলেন, "প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে জানার জন্য অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা এমনিতেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়[১৮] । এখন, যদি অতিপ্রাকৃত কোন ব্যাখ্যা সত্যই চমৎকারভাবে কাজ করতে থাকে তখন সেটাও কি বাদ দিয়ে দেওয়া হবে? কেন?

শুধু দিনেশ ডি'সুজার মতো ব্যক্তিরাই কেবল নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স বিজ্ঞান এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্বন্ধে একই ধরণের অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করে[১৯] -

> "প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে জানার জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার করা হয় । প্রাকৃতিক কারণের আলোকে প্রাকৃতিক মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করা পর্যন্তই বিজ্ঞানের সীমারেখা । অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানের বলার কিছু নেই । সুতরাং ঈশ্বর আছে কি নেই, এমন প্রশ্ন বিজ্ঞানে অবান্তর, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান তার নিরপেক্ষতা ধরে রাখে" ।

অথচ খোদ ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্যদের মধ্যে মাত্র সাত শতাংশ ঈশ্বরে বিশ্বাসী[২০], সুতরাং বাকিরা হয় নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী, যদিও এদের কারোরই অধিকাংশ ধার্মিক আমেরিকানদের সাথে দার্শনিক ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হবার বাসনা নেই ।

বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক (এবং নাস্তিক) স্টিফেন জে গুল্ড তাঁর শেষ বইয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সমঝোতা আনার চেষ্টা করেছেন । বিজ্ঞান ও ধর্মকে তিনি চিহ্নিত করেছেন দুইটি স্বতন্ত্র বলয় [non-overlapping magisteria (NOMA)] হিসেবে, যেখানে বিজ্ঞান তার নিজস্ব বলয়ে কাজ করে প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে বুঝতে, আর ধর্ম অন্য বলয়ে কাজ করে নৈতিকতা বজায় রাখতে[২১] ।

অসংখ্য সমালোচক গুল্ডের বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলেছেন, তিনি ধর্মকে নৈতিকতার দর্শন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছেন। যদিও বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই, কেবল মাত্র নৈতিকতার দর্শনেই ধর্মের কর্মকান্ড সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম প্রাকৃতিক মহাবিশ্ব সম্বন্ধেও নানা ধরণের মতামত প্রদান করে। ধর্ম মতামত করে জীবনের উৎপত্তি নিয়ে, মতামত প্রদান করে মহাবিশ্বের সূচনা নিয়ে- যেই দাবীগুলো সত্যতা কোন নৈতিক ধর্ম দিয়ে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক পক্রিয়ায় জানা সম্ভব। রিচার্ড ডকিন্স তার গড ডিলুশন বইয়ে এবং অন্যত্র গুল্ড প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বলয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন একাধিকবার[২২]।ডকিন্স ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসূত কল্পকাহিনীগুলোকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের বাইরে রাখার চেষ্টাকে অসৎ মনোবৃত্তির পরিচায়ক মনে করেন। তাঁর ভাষায়, ধর্মে যে সমস্ত অলৌকিক গল্প-কাহিনী দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হয়, সেই গল্পগুলির মধ্যে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানের উপকরণ; আর বিজ্ঞান যখন এই সব গাঁজাখুরি গল্প-কাহিনীর সত্যতা এবং সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তখনই বলা হয়, বিজ্ঞান ধর্মে নাক গলাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র বলয়ের প্রবক্তাদের মনে হয় শান্তিকামী, কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে যে শান্তি, তা কাম্য হওয়া উচিৎ নয়। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার, এমনকি বাংলাদেশেও হারুন অর রশিদ কিংবা জাফর ইকবালের মত বিজ্ঞানীও শুধুমাত্র সমন্বয়ের খাতিরে ধর্মবাদীদের সাথে আপোষ করতে প্রস্তুত। স্বতন্ত্র বলয় বা Nonoverlapping Magisteria হচ্ছে তাঁদের এই ধরনের মানসিকতারই ফলশ্রুতি। এঁরা বিজ্ঞান পেশার সাথে জড়িত হলেও বিভ্রান্তির শিকার এবং অবচেতনভাবেই বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছেন।

এবার আসা যাক নৈতিকতা প্রসংগে। মানব সভ্যতার পথপরিক্রমায় ধর্ম এই একটি ক্ষেত্রেও যে খুব অবদান রেখেছে বা রেখে চলছে তাও নয়। এটি সমর্থন করেছে দাস প্রথা, সমর্থন করেছে রাজার একচ্ছত্র অধিকার, সমর্থন করেছে মৃত্যুদণ্ড, অংগচ্ছেদন, হরণ করেছে নারীর স্বাধীনতা। ইরান সহ আরও কিছু মুসলিম দেশে এখনও ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। প্রতিবেশি দেশ ভারতে সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্বামীর সাথে জীবন্ত পোড়ানো হতো স্ত্রীকে। নানা সময়ে নানা জায়গায় ধর্ম ওষুধ গ্রহন করতে বাধা দিয়েছে, বাধা দিয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি ব্যবহারের। সর্বাধিক এইডস আক্রান্ত আফ্রিকায় এইডসের সংক্রামক থেকে নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় যৌনমিলনের আগে কনডম ব্যবহার, সেটাকেও একসময় বাধা দিয়েছিলো চার্চ।

মানুষকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা, সৎ রাখা কিংবা খুনাখুনি থেকে বিরত রাখার জন্য উপরওয়ালার ভয়ের প্রয়োজনীয়তা কতোটুকু সেটাও ভাববার বিষয়। বাস্তবতা হলো, সাধারণ নৈতিক ব্যাপারগুলো (সত্য কথা বলা, সৎ থাকা, হত্যা না করা) বড় বড় ধর্ম শুরু হবার বহু আগে থেকেই মানব সমাজে প্রচলিত ছিলো। সুতরাং ধর্মের যদি কোন উপকারীতা থেকেও থাকে, সেগুলো ধর্ম ছাড়াও সমানভাবে থাকবে, এমন আশা করাটা অযৌক্তিক নয়[২৩]।

ন্যাশনাল একাডেমি এর সদস্যদের মধ্যে যারা মনে করে থাকেন, বিজ্ঞানের ঈশ্বর সম্পর্কে বলার কিছু নেই, তারা আসলে চোখের সামনে থাকা বাস্তবতাকে উপেক্ষা করছেন। হার্ভাড ইউনিভার্সিটি, ডিউক ইউনিভার্সিটি এবং মেয়ো ক্লিনিকের মতো পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা প্রার্থনার কোনো উপকারিতা আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করছেন[২৪]। এখন এই গবেষণাগুলোতে প্রাপ্ত ফলাফল যদি ধনাত্মক হয় এবং এগুলো যদি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের মানুষের উপর একই ধরণের ফলাফল প্রদান করে তাহলে আমরা নব্য নাস্তিকরা অবশ্যই ঈশ্বর বলে একজন থাকতে পারে, এমন ধনাত্মক ধারণা নিয়ে আরও সুক্ষ্ম গবেষণায় আগ্রহী হবো।

হ্যাঁ! উপরের গবেষণাগুলোয় প্রার্থনা কাজ করে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সেটা ব্যাপার না, ব্যাপার হলো পাওয়া যেতে পারতো। তখন ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্যদের মতামত কি হতো? আমরা কি সেই গবেষণা বাতিল ঘোষণা করতাম? করতাম না। ঈশ্বরের মতো একজন, যিনি মানুষের প্রার্থনা শুনেন এবং সেটা কবুল করেন তাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব। কারণ প্রার্থনা কবুলের ফলাফল অনেকসময় পৃথিবীতেই পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যখন পাওয়া যায় তখন সেটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

তবে ধর্মবেত্তা এবং হুজুরেরা এখন অতিপ্রাকৃত বিষয় পরীক্ষায় বিজ্ঞানকে যতই তাচ্ছিল্য করে থাকুক না কেন, আজকে যদি প্রার্থনার সরাসরি উপকারিতা (প্যাসিবো নয়) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হতো তাহলে আমরা অসংখ্য টিভি-চ্যানেল, পত্র- পত্রিকায় বড় করে খবর দেখতাম, "মাওলানা অমুক আলাহর অস্তিত্বের প্রমাণকে স্বাগত জানিয়েছেন!"

বিজ্ঞানও কি বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত?

অনেকেই বলে থাকেন, বাস্তব জীবনের সকল ঘটনা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এমন একটি অন্ধবিশ্বাস লালন করে থাকে নাস্তিকরা, বিশেষ করে নব্য নাস্তিকরা। চারপাশকে তবে কি হিসেবে মনে করা উচিত? অযৌক্তিক? আসলে জগৎ যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক কিছুই না। যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক হলো মানুষের মন, মানুষ। আমরা যখন কোনো বিষয়ের উপর নিজের মতামত প্রকাশ করবো তখন আমাদের চয়ন করা শব্দগুলো হতে হবে অর্থবোধক, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ হতে হবে যৌক্তিক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি পদার্থ বিজ্ঞান সেমিনারের কথা। সেমিনারের মূল বিষয় মহাবিশ্বের সূচনা। পৃথিবীর সেরা পদার্থবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিজেদের গবেষণা, গবেষণার ফলাফল তুলে ধরছেন। তাদের প্রতিটি গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য সূত্রকে আমলে নিয়ে হয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে ধারাবাহিক। এমন সময় মিস্টার যদু মঞ্চে উঠে বললেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ক্রিমিয়াম নামক এক এলিয়েনের কারণে। এক ছুটির দিনে ঘরে বসে বিয়ার তৈরীর সময় হঠাৎ সেখানে বিস্ফোরণ হয়, আর এই বিস্ফোরণই আসলে তথাকথিত "বিগব্যাংগ"- যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই মহাবিশ্বের।

সঠিক উত্তর পাবার জন্য কোন পক্রিয়াটি সঠিক বলে আপনার মনে হয়?

পল ডেভিস বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে বড় সড় তাত্ত্বিক কাজ আছে তার। সেই সাথে তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখকও বটে। কিন্তু পল ডেভিস মাঝে মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের বইপত্তরগুলো পাশে তুলে রেখে ঢুকে পড়তে চান আধ্যাত্মিক জগতে। পল ডেভিস ২০০৭ সালে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এ লেখা একটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানকে আখ্যায়িত করেন ধর্মের মতো নতুন একধরণের বিশ্বাস ব্যবস্থা হিসেবে। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলেন[২৫], "প্রকৃতি যৌক্তিক এমন একটি বিশ্বাসকে পুঁজি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে" ।তিনি আরও বলেন, "যদি ঈশ্বর থেকেই থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া সিদ্ধান্ত নয় বরঞ্চ ব্যক্তিগত আধাত্মিক অভিজ্ঞতাই পারবে তা জানতে।"

কেন? বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ করে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, সেটা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। আর যখনই কিছু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে তখনই বিজ্ঞান সেটি নিয়ে কাজ করতে সক্ষম। বাংলাদেশেই আমরা অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সমৃদ্ধ পীর ফকিরের কথা শুনি, যারা ফুঁ দিয়ে মানুষের রোগ নিরাময় করে দিতে পারেন। এখন ফুঁ দেওয়াটা পীর ফকিরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফলে রোগীর রোগ নিরাময় তো আমরা নিজের চোখে দেখতে পারি। সুতরাং বিজ্ঞান দিয়ে আমরা জানতেও পারবো, আসলেই রোগ সারে কিনা। আমরা তার সামনে একশজন রোগী নিয়ে বসাবো, তিনি ফুঁ দিবেন, তারপর পরীক্ষা করে দেখবো আসলেই একশ জনের রোগ ভালো হয়ে গিয়েছে কিনা। এছাড়াও ভিক্টর স্টেংগর তার নিউ এইথিসজম বইয়ে প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, কিভাবে সেগুলোও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আওতাধীন।

ধর্মবেত্তা জন হট বলেন[২৬], বিবর্তন মানুষের অনুভব করার ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনাঃ "আমাদের বাস্তবতার বিভিন্ন বিষয় অনুভবের যে ক্ষমতা দেখলে বোঝা যায় বিবর্তন ছাড়াও অন্য এক শক্তি আমাদের উপর কাজ করেছে যার ফলে আমরা চিন্তা করতে পারি, যার ফলে আমাদের মন অন্য সবার থেকে আলাদা" ।

তার এই কথা সম্পূর্ন ব্যক্তিগত মতামত। এই ধরণের মতামতকে সাবেক অক্সফোর্ড অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স "অজ্ঞতাপ্রসূত কথা" বলে অভিহিত করেন। বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সেটা হট জানেন না তার মানে এই না যে, কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি তা করেছে। এটা অজ্ঞতা-প্রসূত যুক্তি (argument from ignorance)। আর বিবর্তন মানুষের অনুভুতিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে না কেন? এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই উলেখযোগ্য পরিমাণ কাজ হয়েছে এবং এমন কোন বিপরীত যুক্তি পাওয়া যায়নি যার ফলে আমরা বলতে পারবো এই চিন্তা-ভাবনা করা, অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ, অনুভব করার মতো বিষয় বিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

আমরা কি আমাদের মনকে বিশ্বাস করতে পারি?

ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ জেগেছে? চারপাশে তাকাও তারপর চিন্তা করো গভীর ভাবে। তাহলেই তাকে উপলব্দি করতে পারবে, দূর হয়ে যাবে সকল সংশয়- এমন কথা হরহামেশাই শুনতে পাই আমরা। সত্যের সন্ধান পাবার জন্য মনের উপর শতভাগ আস্থা জ্ঞাপনের আবেদন জানান মসজিদের ঈমান থেকে শুরু করে, ইসলামিক টেলিভিশনের আলোচক, চার্চের ফাদার সবাই।

"মনকে কেন আমরা বিশ্বাস করবো তার সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে সক্ষম ধর্ম। আমরা মনকে বিশ্বাস করবো এই কারণে যে, বস্তুবাদী জ্ঞান, যুক্তি এসব কিছুর ছাড়িয়ে আমাদের মন এক মহাশক্তিধরের গুণাবলী সত্য, সুন্দর দ্বারা আবদ্ধ"

হিটলার বিশ্বাস করেছিলেন তার মনকে, যে মন তাকে বলেছিলো জার্মান জাতির গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সকল ইহুদীকে হত্যা করতে হবে। গোলাম আযম থেকে শুরু করে আজকের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদরা বিশ্বাস করেছিলেন "সকল মুসলমান ভাই ভাই তত্ত্বে"। তাদের মন বলেছিলো পাকিস্তান রক্ষার করতে হবে। বলেছিলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্র সমুন্নত রাখতে গেলে হাত একটু ময়লা করতেই হবে। তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের ভাইকে হত্যা করেছিলো তারা বিনা দ্বিধায়, নিজের বোনকে ধর্ষণ করেছিলো বিনা গানিতে।

নব্য নাস্তিকরা অন্যের মন তো দূরের কথা, নিজের মনকেও বিশ্বাস করেনা। এই কারণেই আমরা বিজ্ঞানের দারস্থ, দারস্থ যুক্তির। অন্যদিকে আমাদের ধার্মিকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছান কেমন করে? মনে মনে চিন্তা করে। অবশ্য ধর্মগ্রন্থে লেখা থাকলেও বহু ধার্মিকই ধর্মগ্রন্থের নৃশংসতা গুলোকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন না। করলে মুসলিম তথা মহুম্মদের অনুসারীরা ইহুদী নাসারাদের যেখানে দেখতো সেখানেই হত্যা করতো, খ্রিষ্টানরা নিজের সন্তান কথা না শুনলে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার করতো, জোসেফ স্মিথের হুকুম অনুসারে মরমনরা যতজন ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারতো (জোসেফ স্মিথকে ঈশ্বর হুমুক করছে, একজন মানুষ যতজন ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে), হিন্দুরা এখনো মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাতো। তবে একজনও যদি করে থাকেন সেটার দায়ভার বর্তায় ধর্মের উপরেই। বিল মার তাঁর মকুমেন্টারি রিলেজুলাস এ চমৎকার ভাবে ব্যাপারটি বলেছিলেন। মানুষ প্রথমে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তারপর যায় ধর্ম গ্রন্থের কাছে। সেখান থেকে তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এমন আয়াত খুঁজে বের করে তারপর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কারণেই জঙ্গীরা নিরীহ জনগন হত্যাকে কুরআনের আয়াত দিয়ে সঠিক কাজ হিসেবে, ঈশ্বরের কাজ হিসেবে প্রচার করে। এ কারণেই ইরানের আয়াতুলাহ গোষ্ঠী মেয়েদের পাথর ছুড়ে জীবন্ত হত্যা করে।

বিশ্বাসের সবচেয়ে ভয়ংকর দিকে এটাই। 'চেক এণ্ড ব্যালেন্সের' কোনও উপায় নেই। আয়াতউলাহ মেয়েদের হত্যা করতে চেয়েছেন পাথর ছুঁড়ে, তারপর সবাইকে দেখিয়েছেন কুরআনের আয়াত। ধর্মবিশ্বাসীরা সেই আয়াতকে অস্বীকার করতে পারবেনা, পারেনি, তাই আজকে ইরানে স্বতস্ফুর্ত ভাবেই হয় এই ঘৃণ্য মানবতা বিরোধী কাজ।

বিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ একবার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন[২৭],

> 'ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভাল মানুষেরা ভাল কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভাল মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।'

প্রাচীন ধর্মগুরুদের মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখা কথায় নতুন ধর্মগুরুরা যখন ইচ্ছা মত ব্যাখ্যা আরোপ করে। আর তার উপর, শুধু আমার মন চাইছে সেই যুক্তিতে, যখন দলে দলে মানুষ স্থাপন করে সংশয়হীন আস্থা। যখন বিনা প্রশ্নে স্থাপন করে দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস। তখনই আমরা মানবইতিহাসের করুণতম বিপর্যয়গুলো ঘটতে দেখি। আমরা দেখি ধর্ম-যুদ্ধের নামে জীবন দিচ্ছে কোটি কোটি মানুষ, নিশ্চিহ্ন হচ্ছে শহর-নগর-সভ্যতা। প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হচ্ছে নিরীহ নারী-পুরুষ। শিক্ষা আর জ্ঞানের সকল পথ বন্ধ করে পুরো জাতিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বর্বর অন্ধকারের দিকে। পরকাললোভী কিছু মানুষ ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে দিকে দিকে। আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে এত কিছুর পরেও চারিদিকে চলছে ধর্মের জয়জয়কার। ধার্মিক ভালোমানুষের দল তাদের প্রশ্নহীন মন নিয়ে রাতে দিচ্ছে শান্তির ঘুম। কারণ তাদের মন বলছে। এতেই মঙ্গল।

বিজ্ঞান ও ধর্ম কি সাংঘর্ষিক নয় ?

প্রতিটি যুগে খুব ফলাও করে ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় কিংবা সম্প্রীতির কথা বলা হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস কারো অজানা নয়। খ্রীষ্টজন্মের পাঁচশ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাক্সু সিমন্ডের মত অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকেরা জানিয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহমাত্র, সূর্যকে ঘিরে অন্য সকল গ্রহের মত পৃথিবীও ঘুরছে। ধর্মবিরোধী এই মতামত প্রকাশের জন্য এদের অনেককেই সে সময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। এই 'কুফরি' মতবাদকে দুই হাজার বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস। বাইবেল বিরোধী এই সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচারের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোকে কিরকমভাবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল সে এক ইতিহাস। ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু ব্রুনোই নন, তার সমসাময়িক লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থোলোমিউ লিগেট সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। খ্রীষ্টের জন্মের চারশ পঞ্চাশ বছর আগে এনাক্সোগোরাস বলেছিলেন চন্দ্রের নিজের কোন আলো নেই। সেই সঙ্গে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আর চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এনাক্সোগোরাসের প্রতিটি আবিস্কারই ছিল ধর্মবাদীদের চোখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বর বিরোধিতা, ধর্ম বিরোধিতা আর অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ আর নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র এবং ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস ঘোষনা করলেন- মানুষের অসুস্থতার কারণ কোন পাপের ফল কিংবা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ হল জীবাণু। ওষুধ প্রয়োগে জীবাণু নাশ করতে পারলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে। প্যারাসেলসাসের এই 'উদ্ভট' তত্ত্ব শুনে ধর্মের ধ্বজাধারীরা হা রে রে করে উঠলেন। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্মবিরোধি মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হয়েছিল 'বিচার' নামক এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকেরা ব্রুনোর মতই প্যারসেলসাসকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছিলো। প্যারাসেলসাসকে সেদিন জীবন বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছিলো। অত্যাচার আর নির্যাতন শুধু খ্রীষ্টানদের একচেটিয়া ভেবে নিলে ভুল হবে - আজকে মুসলিমরা ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের মত দার্শিনিকদের জন্য গর্ববোধ করে- কিন্তু সে সব দার্শনিকদের সবাই তাদের সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্য কিংবা মুক্তমত প্রকাশের কারণে মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত, নির্যাতিত কিংবা নিহত হয়েছিলেন।

আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের উপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনী পোড়ানোর মত তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোন নতুন আবিস্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায় আস্তাকুঁড়ে। তাতে আবশ্য লাভ হয় না কিছুই। অযথা গোলমাল বাধিয়ে নিজেরাই বরং সময় সময় হাস্যাস্পদ হন। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনো বিবর্তন তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনী গুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনো সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোলার দল প্রগতিশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিকদেরকে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এ তো গেল আমাদের মত দেশগুলোর অবস্থা। তথাকথিত 'উন্নত বিশ্বে' এখনো অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষত পাদ্রী আর মোলারা উপযাজক সেজে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দিতে আসে বিজ্ঞানীদের কোন গবেষণা নৈতিক, আর কোনটা অনৈতিক; কিংবা দাবী তূলে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনের পাশাপাশি 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করার। কিন্তু এ ধরণের দাবী কতটুকু যৌক্তিক?

২০০৯ সালে মুক্তমনার পক্ষে থেকে একটি ই-সংকলনের জন্য লেখা আহ্বান করা হয়েছিল। সংকলনটির শিরোনাম ছিল 'বিজ্ঞান ও ধর্মঃ সংঘাত নাকি সমন্বয়?' (বইটি ২০১১ সালে অঙ্কুর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিতব্য)। এই সংকলনের মাধ্যমে বাংলায় প্রথমবারের মতো বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা, জানা এবং বোঝার একটি চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, বিজ্ঞান এবং ধর্ম- দুটোর প্রভাব এবং গুরুত্ব আমাদের জীবন এবং সংস্কৃতিতে অপরিসীম। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কেমন?

অধিকাংশ লেখকই সংকলনটিতে মত দিয়েছেন বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং তা খুব স্পষ্ট। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে লেখকেরা অর্থহীন এবং বিভ্রান্তিকর বলে রায় দিয়েছেন। তারা যৌক্তিকভাবেই মনে করেন, ধর্মের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং অভিমতকে বিজ্ঞান যুগে যুগে ভুল প্রমাণ করেছে বহুবার। এর মধ্যে পৃথিবীর বয়সের ভ্রান্ত অনুমান, ভু-কেন্দ্রিক তত্ত্ব, আত্মার অনুমান, সৃষ্টিতত্ত্বের নানা কেচ্ছা-কাহিনীসহ অনেক কিছুই আছে। এ বিপুল মহাবিশ্বকে ঘড়ির সাথে তুলনা করাকে তাঁরা অতি সরলীকরণ এবং ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, আধুনিক

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই কোন কারিগর ছাড়া মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে আজ ব্যাখ্যা করতে পারে। মহাবিশ্বের কারিগরের ধারণাকে তারা দার্শনিকভাবেও ভ্রান্ত বলে তারা মনে করেন, কারণ সব কিছুর পেছনে একজন কারিগর থাকলে, সেই কারিগর কোত্থেকে উদ্ভুত হল সেটাও তো বলতে হবে। তারা আরো মনে করেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে কোন আধুনিক বিজ্ঞান নেই, বরং আছে আধুনিক বিজ্ঞানের নামে চতুর ব্যাখ্যা এবং গোঁজামিল। সেজন্যই, ধর্মের কাছে বিজ্ঞানের কখনো দারস্থ হতে হয় না, বরং ধর্মবাদীরাই আজ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের পর নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে দিতে মুখিয়ে থাকে। কারণ ধর্মবাদীরা জেনে গেছে, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান ঠিকই টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া ধর্মগুলো বেঁচে থাকার আর কোন অক্সিজেন খুঁজে পাচ্ছে না। অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ তার 'বিজ্ঞানমনস্ক ধারা ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে' নামক চমৎকার প্রবন্ধটিতে বলেন[২৮],

> বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা বিজ্ঞানকে কখনোই ধর্ম বানাতে চাননা, কিন্তু সমন্বয়পন্থী ধর্মাচ্ছন্নরা ধর্মকে সবসময়েই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ নিয়ে বিজ্ঞানমনস্করা খুব একটা বিচলিত নন, বরং ধর্মাচ্ছন্নদেরই এ নিয়ে বেশী হইচই করতে দেখা যায়। এই দু'এর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনও ধর্মের প্রবক্তারাই অনুভব করেন বেশী। ধর্মবাদীরাই ধর্মকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানমনস্করা নয়। রাসেলের ভাষায়, "বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা মানে না, গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কর্তৃত্বসম্পন্ন কেউ বলেছে বলেই কোন কিছু মেনে নিতে হবে- বরং ঠিক উল্টোটা, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যা জানা যায় শুধুমাত্র তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়। এই 'নতুন' পদ্ধতির অভুতপূর্ব সাফল্য- তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ- ধর্মবাদীদের বাধ্য করে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে"।

পাশ্চাত্যের ধর্মবেত্তারা বলে বেড়ান আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিলো ইউরোপে, খ্রিস্ট ধর্মের হাত ধরে। উদাহরণ হিসেবে দেখান, গ্যালিলিও (মৃত্যু ১৬৪২) ও আইজাক নিউটনের (মৃত্যু ১৭২৭) মতো প্রথম দিগকার খ্যাত নামা বৈজ্ঞানিকদের যারা ধার্মিক ছিলেন। অবশ্যই! গ্যালিলিও ও ব্রুনো (মৃত্য ১৬০০) এর জীবন কাহিনি আমাদের বর্ননা করে, ধার্মিক হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথও তাদের সামনে খোলা ছিলোনা। তারপরেও তারা ধার্মিকদের রোষানল থেকে রেহাই পেলেন কই?

বিজ্ঞান ও ধর্মের সহস্রবছর ধরা চলা সংঘর্ষের পুংখানুপুংখ বিবরণ পাওয়া যায় উনিশ শতকে প্রকাশিত দুইটি বইঃ J.W. Draper এর "History of the Conflict between Science and Religion (1873)[29] এবং Andrew Dickson White এর "History of Warfare of Science with Theology (1896)[30]" এ। এরপর থেকেই দীর্ঘদিনের এই প্রাচীনতম সংঘাতের বর্ণনা ধীরে ধীরে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে[৩১]। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং ধর্মের সংঘর্ষ মোচনে বিলিয়ন ডলার খরচ হলেও বিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এসে সেই সাম্যবস্থা একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে, মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন সেই প্রবাদ- উলু বনে মুক্তা ছড়ানোর কথা।

মুসলমানদের মধ্যে বিবর্তন বিশ্বাসের হার এক শতাংশও হবেনা, যদিও আমার হাতে কোন পরিসংখ্যান নেই, কিন্তু সমস্ত মুসলিম প্রধানদেশগুলোতেই হারুন ইয়াহিয়া আর জাকির নায়েকের বিবর্তন সম্বন্ধে ভুল বক্তব্য সম্বলিত সিডি এবং বইয়ের যেভাবে প্রচারণা চলে তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। মুসলিম সাহিত্য, মুসলিম অনুষ্ঠান এবং বর্তমান সময়ের আলোচিত মুসলিম স্কলারদের বক্তব্যে বিবর্তন সম্পর্কে মুসলমানদের রায় সহজের অনুধাবন করা যায়। মুসলমানরাও খ্রিস্টান এবং ঈহুদীদের মতো বিশ্বাস করে থাকে আদম এবং হাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো মানব জাতির। বাকি সকল জীবিত প্রাণের

সৃষ্টি হয়েছে এই মানুষদের খেদমত করার জন্য। বিবর্তন নিয়ে আলোচনা নয়, মশা- মাছি বা সমুদ্রের পাদদেশে শিলালিপিতে অবস্থিত এককোষী ব্যাকটেরিয়া সদৃশ স্ট্রমেটোলাইটস কেমন করে মানুষের খেদমত করতে পারে সে সন্দেহ দূরীভূত করার ক্ষেত্রেই মুসলিম স্কলাররা বেশি মনোযোগী। ক্ষেত্র বিশেষে তারা বিবর্তন বিরোধী বক্তব্য দিয়ে থাকেন অবশ্য।

খ্রিস্টানদের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে রয়েছে পরিসংখ্যান। ২০০৬ সালের পিউ সার্ভে থেকে জানা যায়, খ্রিস্টান গ্রুপ হোয়াইট ইভানজেলিকালসদের ৬৫ ভাগ মনে করে মানুষ সহ পৃথিবীর সকল জীবিত প্রাণী বর্তমানে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমন ভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো। অপরদিকে মেইনল্যান্ড প্রটেস্ট্যানসদের মধ্যে ৬২ ভাগ বিবর্তনকে সত্য বলে মনে করে, যাদের মধ্যে মাত্র ৩১ ভাগ প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বিবর্তন হবার কারণ হিসেবে দেখে, ২৬ ভাগ মনে করে ইশ্বর বিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিবর্তনের কারণ হিসেবে ডারউইন/ ওয়ালেস প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব আজকে প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক শাখার মূল কাঠামো।

ক্যাথোলিক চার্চ অফিসিয়ালি বিবর্তনকে সঠিক বলে রায় দিয়েছে। একই সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকেও সঠিক বলে তারা মানে যদিও মনে করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পেছনে রয়েছে ঈশ্বরের হাত। তারপরও ৩৩ ভাগের মতো ক্যাথলিক মনে করে জীবিত কোন প্রানী বিবর্তনের মাধ্যমে আসেনি। ৬৯ ভাগ মনে করে সময়ের সাথে সাথে প্রাণী বিবর্তিত হয়েছে, যাদের মাঝে ২৫ ভাগ কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সত্য বলে মানে। সুতরাং চার্চ যত যাই বলুক না কেন, দেখা যাচ্ছে বিবর্তনকে স্বীকার করে নেবার মতো মানসিক অবস্থায় ক্যাথলিকরা এখনও পৌঁছায় নি।

সংক্ষেপে তিনভাগের একভাগেরও কম আমেরিকান সত্যিকার অর্থেই বিবর্তন বলতে যা বোঝায় সেটি বিশ্বাস করে যে বিবর্তন বিদ্যা দিয়ে তাবত জীব-বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলছেন অবিরত।

বিবর্তন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে এর বিভিন্ন দ্বন্দ নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটি অধ্যায়ে আলোচনা করে হয়েছে মহাবিশ্বের সূচনা সম্বন্ধে। আশা করা যায়, কেন বিজ্ঞান এবং ধর্ম সাংঘর্ষিক সেটার ধারণা পাঠক সেখানে পাবেন।

গত শতাব্দীর অসংখ্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিজেদের নাস্তিকতা প্রকাশে দ্বিধা বোধ করেননিঃ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ, স্টিফেন পিনকার, স্টিফেন হকিং, জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক, কার্ল সাগান, রিচার্ড ফাইনম্যান, এডওয়ার্ড ও উইলসন, সর্বোপরি আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯৯৮ সালে নেচার পত্রিকার এক প্রবন্ধে এডওয়ার্ড লারসন ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস এর ৫১৭ জন সদস্যের উপর করা এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। সেখানে দেখা যায়, সাত ভাগ সদস্য আব্রাহামিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ৭২.২ ভাগ অবিশ্বাসী এবং ২০.৮ ভাগ "অজ্ঞেয়বাদী"!

বিজ্ঞান এবং ধর্মের ভারসাম্য

অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঈশ্বরে অবিশ্বাসী প্রধানত দুইটি কারণে। এক) ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কোনও প্রমাণ খুঁজে না পাওয়া, দুই) প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় ঈশ্বরকে বসানোর কোনও প্রয়োজনীয়তা না থাকায়। তারপরও আগের আলোচনায় অনুসারে আমরা দেখতে পাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানী, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে স্টিফেন গুল্ডের "স্বতন্ত্র বলয়" হিসেবেই দেখতে বেশি আগ্রহী। এই অবস্থান গ্রহণের ফলে তারা ধর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয় থেকে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান করেন।

বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় - গবেষণা চালিয়ে যাবার অর্থ। ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অর্থাগমনের পথকে কন্টকাকীর্ণ করতে তাদের কেউই আগ্রহী নন। অন্যদিকে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের অনেকে মাথার মধ্যে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের জন্য দুটি আলাদা কক্ষ তৈরী করে নির্দিষ্ট সময়ে যেকোনও একটিতে অবস্থান করে বাকিটার কথা ভুলে যান!

উপরের উদাহরণগুলো একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে যদি ব্যক্তিটি হয়ে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক এবং বর্তনাম সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শমসের আলী কিংবা আমেরিকার খ্যাতনামা এবং প্রতিভাবান চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং "হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের" সাবেক প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্স।

ইভাঞ্জেলিকাল খ্রিস্টান ফ্রান্সিস কলিন্স ২০০৬ সালে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে দেখানোর জন্য লিখেন, "ঈশ্বরের ভাষা" নামে বই[৩২]। একই বিষয় নিয়ে, একদল খ্রিস্টান চিকিৎসকের সামনে উপস্থাপন করা কলিন্সের একটি আলোচনার ভিডিও ইয়ুটিউবের কল্যানে অনেকেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে কলিন্স যখন বিজ্ঞানী হয়েও নিজেকে একজন গর্বিত যীশু খ্রিস্টের অনুসারী বললেন, তখন মুহুর্মুহু করতালীতে তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শ্রোতারা। বক্তব্যের এক পর্যায়ে যখন বিজ্ঞান আলোচনা শুরু হলো এবং কলিন্স যখন বিবর্তনের সত্যতা এবং কেমন করে বিবর্তন ঈশ্বরেরই একটি মহিমা হতে পারে তা বলা শুরু করলেন তখন দেখা গেলো মাথা নেড়ে নেড়ে অনেকেই বের হয়ে যাচ্ছেন মিলনায়তন থেকে। "নাহ! এনাকে দিয়ে হবেনা"- চোখে মুখে এমন একটা অভিব্যক্তিই ছিলো বিদায়ী দর্শকদের!

এবার আসা যাক বইয়ের প্রসংগে। বইটিতে কলিন্স তার, ডিএনএ এবং মানব জিন নিয়ে করা গবেষণা বেশ চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। একই সাথে ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং এর নতুন রূপ, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অসংখ্য ত্রুটিও তিনি আলোচনা করেছেন।

কিন্তু বইয়ের মূল যে লক্ষ্য অর্থাৎ "বিশ্বাসের প্রমাণ" উপস্থাপন করা- সেটা হয়েছে সামান্য এবং যতটুকুও হয়েছে ততটুকুও স্ববিরোধীতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতিতে থাকা জটিল প্রানী, বিশেষ করে জটিলতর মানুষ যে বিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয়েছে এটা স্বীকার করে কলিন্স বলেছেন, হতে পারে বিবর্তন নামক পক্রিয়া দিয়েই ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিবর্তনে ঈশ্বরকে আমদানী করলেও এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে পারেন নি কলিন্স। বিবর্তনে ঈশ্বর নামক বহির্জাগতিক শক্তির কোনও ধরণের প্রয়োজনীয়তাই নেই, প্রাকৃতিকভাবেই সবকিছু সম্ভব।

বিবর্তনের পর বিগব্যাংগ নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে কলিন্স বলেন, "আমি বুঝিনা কেমন করে এমনি এমনি প্রকৃতির সৃষ্টি হতে পারে। কেবল মাত্র স্থান এবং সময়ের বাইরে অবস্থান করা একজন অতিপ্রাকৃত শক্তিরই সামর্থ্য আছে এই বিপুল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার"। কলিন্সের কাছে "আমি বুঝিনা কেমন করে" কথাটি যেন মহাবিশ্ব একজন ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণার জলজ্যান্ত প্রমান!!! কেউ কিছু না বুঝে থাকতেই পারেন, কিন্তু তার মানে এই না যে, তিনি না বুঝলেই সেটা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ! অজ্ঞতাসূচক যুক্তির আরেকটি চমৎকার উদাহরণ।

মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধীতাকারী এবং যুদ্ধচলাকালীন খুন- ধর্ষন সহ অসংখ্য মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডে অভিযুক্ত জামায়াতের উচ্চপদস্থ নেতা মীর কাশেম আলীর মালিকানাধীন দিগন্ত টেলিভিশনে, জামায়াতের আরেক তাত্ত্বিক এবং সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি শমসের আলী, কুরআনের বিজ্ঞানময় দিক নিয়ে একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানটির একটি পর্ব আলচ্য বিষয় ছিলো মহাবিশ্বের সূচনা। একইসাথে কুরআনে সে সম্পর্কিত আয়াত বর্ণনা করে কুরআনকে মহা বিজ্ঞানময় গ্রন্থ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা। শমসের আলীকে পদার্থবিজ্ঞানী বলা হয়ে থাকলেও মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান কি বলছে সেটাও তিনি জানেন না, কিংবা জানতে চান না । তিনি জানেন না যে, বিগ ব্যাংগ

থেকে স্থান- কালের সূচনা হয়েছে এমন ধারণা জ্যোতিবিজ্ঞানে এখন মৃত। ১৯৭০ সালে স্টিফেন হকিং বলেছিলেন, পয়েন্ট অব সিঙ্গুলারিটির কথা। পয়েন্ট অব সিংগুলারিটি অসীম ভর ও ঘনত্ব বিশিষ্ট একটি বিন্দু। হকিং বলেছিলেন, এই বিন্দু থেকেই বিগব্যাঙ এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিলো মহাবিশ্বের। অবশ্য আঠারো বছর পর, অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে হকিং তাদের আগের গননার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে, ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম বইতে বলেন, " There was in fact no singularity at the beginning of universe "- "মহাবিশ্বের সূচনার সময়ে সিঙ্গুলারিটির অস্তিত্ব ছিলোনা"।

সিংগুলারিটির ধারণা হকিং সহ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা বহু আগে ত্যাগ করলেও ত্যাগ করেনি শমশের আলীর মতো 'বিজ্ঞানীরা'। কুরআনে সিংগুলারিটির আর বিগ ব্যাঙ -এর উলেখ আছে সেটা দেখানোর জন্য শমসের আলী অন্যান্য অনেক মুসলিম পণ্ডিতদের মতো উপস্থাপন করেন সুরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াত।

> "Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder?..... "
>
> ("অবিশ্বাসীরা কি দেখেন না যে, পৃথিবী এবং স্বর্গ একসময় একত্রে ছিলো অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করলাম .....")

এ আয়াতের সাথে বিগব্যাঙের তুলনা হয় কেমন করে? 'বিস্ফোরণ' এবং 'আলাদা করা/ পৃথক করা' শব্দদুটির মানে কি এক? স্বর্গ থেকে পৃথিবীকে সরিয়ে আনা কৌরানিক বিগ ব্যাঙ হতে পারে, কিন্তু সত্যিকার বিগ ব্যাঙের প্রায় নয়শ কোটি বছর পর বিশাল মহাবিশ্বের এক কোনায় সৃষ্টি হয়েছিলো পৃথিবী নামক গ্রহটি।

কলিন্স এবং শমসের আলীর মতো বিজ্ঞানীরা সূক্ষ সমন্বয় (Fi ne t une) নামক এক ধারণার কথা সুযোগ পেলেই বলেন। কলিন্স তার বইয়ে বলেছেন, শমসের আলী বলেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধ, আলোচনা অনুষ্ঠানে। তাদের মতে, মহাবিশ্ব বেশকিছু ধ্রুবকের মান চমৎকার ভাবে টিউন করা। একটি ধ্রুবকের মান অন্য কিছু হলেই মহাবিশ্বে জীবনের সৃষ্টি হতোনা। এবং এ সিদ্ধান্ত তারা কিভাবে পেলেন? তারা কেমন করে জানলেন, যে ধ্রুবকের মান "অন্য রকম" হলে "অন্য রকম" ভাবে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারতোনা? বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার ' The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশের উদ্ভব ঘটতে পারে। এর জন্য কোন সূক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'সূক্ষ্ম-সমন্বয়বাদীদের দাবীর এমন কোন ভিত্তি নেই যাতে তারা অনুমান করতে পারেন যে, একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়া জীবন সৃষ্টি অসম্ভব'- তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। এছাড়াও 'Physical Review' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত্য রাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোন একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব - কোন ধরনের ফাইন টিউনিং কিংবা এন্থ্রোপিক আর্গুমেন্টের-এর আমদানী ছাড়াই[৩৩]।

তারচেয়েও বড় কথা, মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর এমন এক মহাবিশ্বই বা কেন সৃষ্টি করলেন কেন যে, পরবর্তীতে তাকে উলটা ঘুরে সেটাকে আবার জীবনের উপযোগী করে ফাইন টিউন করতে হলো? তিনি তো চাইলে যে

কোন পরিবেশ এমনকি শূন্যস্থানেও বেঁচে থাকার উপযোগী প্রাণ সৃষ্টি করতে পারতেন। এবং এটাই ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সবচেয়ে বড় ফাটল। কোন সুনিপুন নকশাকারী দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে বলে, মহাবিশ্ব এবং প্রাণ এমন নয়। কোন ধরণের ডিজাইন করা না হলে মহাবিশ্ব এবং প্রাণের যেমন হবার কথা এটি তেমন।

বিজ্ঞান কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমান করতে সক্ষম?

পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলেছে কেবল মাত্র দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব। আরও দেখতে পাই, এই পুরোটা সময় জুড়ে বিজ্ঞান সাইড লাইনে বসে শান্ত ছেলের মতো উপভোগ করেছে দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকদের কথার খেলা। যদিও বিজ্ঞানের বৈপবিক অগ্রগতিতে আজ মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক আলোকিত, প্রাকৃতিক মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক পরিষ্কার, কিন্তু তারপরও গ্যালারিতে একটি ধ্বনি এখনও উচ্চারিত হয়ঃ বিজ্ঞানের ঈশ্বর সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার নেই। ঈশ্বর, যিনি কিনা সকল বাস্তবতার উৎস, বাস্তবতার ব্যাখ্যাকারী বিজ্ঞানের অধিকার নেই, তার সম্পর্কে কথা বলার!

'রক অফ এজেস' নামে ২০০৩ এ প্রকাশিত বইয়ে, বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্টিফেন জে গুল্ড কর্তৃক ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র বলয় হিসেবে ভাবার প্রস্তাবনা এই লেখার শুরুতেই আমরা জেনেছি। জে গুল্ড বিজ্ঞানকে প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার হাতিয়ার আর ধর্মকে নৈতিকতার দর্শন হিসেবে অভিহিত করার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র আলাদা করে সংষর্ষ এড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু তার প্রস্তাবনা মহান হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মের কর্মক্ষেত্র বণ্টন ত্রুটিময়। ধরা যাক, ইসলাম ধর্ম মানুষের নৈতিকতা বিষয়ে দিক- নির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু একই সাথে অসুখ হলে অনেক মুসলমান মসজিদের হুজুরের কাছে যান, পানি- পড়া গ্রহণ করতে। যেখানে এক গাস পানিতে কিছু দোয়া পড়ে হুজুররা ফুঁ দিয়ে দেন। ইসলামে বিশ্বাসীদের মতে এই পানি পড়া রোগীর রোগ দূর করতে সক্ষম। এখন ভেবে দেখুন তো এখানে কি বিজ্ঞানের কিছুই করার নেই? আছে। বিজ্ঞান এই পানি পড়ার রাসায়নিক বিশেষণ করে দেখতে সক্ষম- ঐশ্বরিক এই পানি- পড়াতে আসলেই কোনো রোগ ব্যধি সারানোর নিয়ামক আছে, নাকি এটি শুধুই পানি! একই সাথে নৈতিকতা- যার ফলাফল/ পরিমান পর্যবেক্ষণ যোগ্য, যার উৎপত্তি হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে সেটি নিয়েও বিজ্ঞান কেন কথা বলতে পারবে না? পারবে এবং নৈতিকতার প্রকৃতি গবেষণায় বিজ্ঞান ইতিমধ্যে অনেক দূর পথ পাড়িও দিয়ে ফেলেছে।

ধর্মবেত্তারা বিজ্ঞানের ঈশ্বর আলোচনার সমালোচনা করলেও, নিজেরা ঠিকই সেই খ্রিস্টপূর্ব ৭৭ সাল থেকে ঈশ্বরের অস্তি ত্বের বিজ্ঞানময় যুক্তি প্রদান করে চলছেন। ইসলামী বিশ্বে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা, ভারতীয় ধর্মব্যবসায়ী জাকির নায়েক তার অসংখ্য লেকচারে বিজ্ঞানের আলোকে আলাহর অস্তিত্বে প্রমান করেছেন। এছাড়াও আলাহ প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থ কোরআন শরীফকেও বিজ্ঞানময় করার চেষ্টা চলছে শত বছর ধরে। ইসলামী ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি ঘাটলেই কুরআন এবং বিজ্ঞান, বিজ্ঞাময় কুরআনের মতো অসংখ্য বইয়ের সন্ধায় পাওয়া সম্ভব। একথা শুধু ইসলামের জন্য প্রযোজ্য না, প্রযোজ্য সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই। সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানময় প্রমান করার চেয়ে তার প্রেরিত গ্রন্থকে বিজ্ঞানময় প্রমান আপেক্ষাকৃত সহজ বলেই মনে করে থাকেন, ধর্মতত্ত্ববিদরা। গ্রন্থ বিজ্ঞানময় প্রমান হলেই, প্রমান হবে ঈশ্বর আছেন। যিনি কিনা হাজার বছর আগেই বর্ননা করে গেছেন বিজ্ঞান সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত নানা বিষয়। খ্রিস্টান ধর্মকে বিজ্ঞানময় প্রমান করার জন্য ১৯৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা হয় টেম্পলিটন ফাউন্ডেশন। এখন পর্যন্ত কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করা এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ধর্মীয় বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ৬০ মিলিয়ন ডলার বৃত্তি প্রদান করা হয়। দেখা যাচ্ছে, ধর্ম

নিজেদের বিজ্ঞানময় করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরত, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই ধর্মের উৎস, ঈশ্বর নিয়ে কথা বলার!!

এবছর বাংলা একাডেমি বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে অভিজিৎ রায় এবং আমার লেখা অবিশ্বাসের দর্শন নামে একটি বই। সেখানে দুটি আলাদা অধ্যায়ে বিজ্ঞানের মাইক্রোস্কোপের নীচে ইশ্বরের অস্তিত্বের প্রমান খোঁজা হয়েছে । আমরা বলতে চাই, বিজ্ঞান এখন এতোটাই উন্নত যে এর মাধ্যমে আমরা ইহুদি- খ্রিস্টান- মুসলিমদের পুজণীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি ধর্মে ঈশ্বরকে দেখা হয় পদার্থ, স্থান এবং কালোত্তীর্ণ একজন অতিপরাক্রমশালী স্বত্তা হিসেবে- যদিও তার সকল কর্মকান্ডই সময়- স্থান, কাল এবং পদার্থকে ঘিরে। এই ঈশ্বর ডেইজম বা যৌক্তিক একশ্বেরবাদীদের বিশ্বাস করা ঈশ্বর, যিনি কিনা মহাজাগতিক কোন কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেনা, প্রার্থনা শুনেন না এমন ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ন আলাদা প্যান্থিয়েজম বা সর্বেশ্বরবাদে (প্রতিটি স্বত্তাই ঈশ্বর) বিশ্বাসীদের ঈশ্বর থেকে। তিনি মহাবিশ্বের প্রতিটি ন্যানো মিটারে, ন্যানো সেকেণ্ড থেকে ন্যানো সেকেণ্ডে ঘটা সকল ঘটনা থেকে শুরু করে অতিদূরবর্তী গ্যালাক্সিতে আনবিক নিউক্লীতে কোয়ার্ক কণার ক্ষীণ আন্তঃক্রিয়ার ফলে তারা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। একই সাথে তিনি তার সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ থেকে শুরু করে সৃষ্টির অ-সেরা জীব পর্যন্ত সবার প্রতি সেকণ্ডের চিন্তা সম্পর্কে অবগত থাকেন, শুধু তাই না তিনি প্রার্থনা শুনেন, এবং তার দলের লোকদের জয় নিশ্চিতে ভুমিকা রাখেন বলে বিশ্বাসীরা দাবী করেন। এই দাবীগুলোকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসা যাবে না কেন? নিশ্চয় যাবে - এটাই হোক আগামী দিনের বিজ্ঞানের অনার্য সঙ্গীত।

লেখকঃ রায়হান আবীর। তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশলী। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এণ্ড টেকনোলজি বিভাগে গবেষক হিসেবে কমরত। লেখাটি 'অবিশ্বাসের দর্শন' (শুদ্ধস্বর, ২০১১) বইয়ের একটি উল্লেকযোগ্য অংশ। ইমেইল ঠিকানা raihan1079@gmail.com

তথ্যসূত্র

[১] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পুনর্মূদ্রণ ২০০৬)
[২] Stephen Hawking and , Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010

[৩] Victor J. Stenger, "The New Atheism". Colorado University. http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/battle.html.

[৪] Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008
[৫] ফরিদ আহমেদ, প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?, মুক্তমনা

[৬] Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008 থেকে উদ্ধৃত

[৭] Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA , 1995

[৮] অনুবাদটি মুক্তান্বেষা পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) কেন আমি সংশয়বাদী? শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে

[৯] অপার্থিব, স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মুক্তমনা (স্বতন্ত্র ভাবনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি, নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, সম্পাদর - সাদ কামালী ও অভিজিৎ রায়,অংকুর প্রকাশনী)

[১০] Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2008

[১১] Michael Martin Michael Martin and Ricki Monnier, The Impossibility of God, Prometheus Books, 2003

[১২] David Marshall, The Truth behind the New Atheism , Eugene, Or: Harvest House, 2007

[১৩] উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন, Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow, Boston: Houghton Mifflin, 1998

[১৪] অপার্থিব জামান, বিজ্ঞান, শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব,মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

[১৫] David Berlinski, The Devil's Delusion , New York: Crown Forum, 2008, পৃষ্ঠা নং ৬

[১৬] David Berlinski, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪

[১৭] Dinesh D'Souza, What's So Great about Christianity? , Washington, DC: Regnery, 2007, পৃষ্ঠা নং 157

[১৮] Barry Palevitz, ÒScience vs. ReligionÓ in Science and Religion: Are The Compatible? ed. Paul Kurtz , Amherst, NY: Prometheus Books, 2003, পৃষ্ঠা নং 175

[১৯] National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC: National Academy of Science, 1998), পৃষ্ঠা নং 58| অনলাইন সংস্করণঃ http://www.nap.edu/catalog/5787.html

[২০] Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998) , Macmillan Publishers Ltd.

[২১] Stephen Jay Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, Library of Contemporary Thought (New York: Ballantine, 1999)

[২২] রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), “When Religion Steps on Science's Turf The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy”, Council for Secular Humanism. Brief paraphrase of:

“There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that all religious beliefs are outside the domain of science. On the one hand, miracle stories and the promise of life after death

are used to impress simple people, win converts, and swell congregations. It is precisely their scientific power that gives these stories their popular appeal. But at the same time it is considered below the belt to subject the same stories to the ordinary rigors of scientific criticism: these are religious matters and therefore outside the domain of science. But you cannot have it both ways. At least, religious theorists and apologists should not be allowed to get away with having it both ways. Unfortunately all too many of us, including nonreligious people, are unaccountably ready to let them."

[২৩] অভিজিৎ রায়, নৈতিকতা ও ধর্ম, স্বতন্ত্র ভাবনা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮

[২৪] H. Benson, J.A. Dusek, J.B. Sherwood, P.Lam, C.F. Bethea. ÒStudy of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patient,Ó American Heart Journal 151, no. 4:934-42

[২৫] Paul Davies, "Taking Science on Faith", New York Times, November 24, 2007

[26] John F. Haught, God and the New Atheism, Westminster John Knox Press, 2007 c…ôv bs 46

[২৭] অভিজিৎ রায়, নৈতিকতা ও ধর্ম, স্বতন্ত্র ভাবনা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮ দ্রষ্টব্য

[২৮] ইরতিশাদ আহমদ, বিজ্ঞানমনস্ক ধারা ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে, বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয়? মুক্তমনা ই-বুক, (অঙ্কুর প্রকাশনী, প্রকাশিতব্য ২০১১)

[২৯] Jhon William Draper, *History of the Conflict between Religion and Science* , London: Watts & CO., 1873

[৩০] Andrew Dickson White, *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom* , New York: D. Appleton & CO.,1896

[৩১] Paul Kurtz, ed., Science and Religion: Are the Compatible?, Prometheus Books , 2003

[৩২] Francis S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence of Belief , New York: Free Press, 2006

[৩৩] Anthony A, 2001, The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments, Journal of Physical Rev, D64:083508.